BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY

RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03020027

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 02| February 2025| e-ISSN: 2584-1890

বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা

অর্পিতা চৌধুরী

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract:

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে লোকদেবতার প্রভাব বাঁকুড়া জেলা তার ব্যতিক্রম নয় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও প্রাচীনত্বের দিক থেকে পশ্চিমবাংলার বোধহয় সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা বাঁকুড়া।এই জেলায় মানুষের বিশ্বাসে মিশে রয়েছে অসংখ্য লোকদেবতা বেশিরভাগেরই কোন প্রতিষ্ঠিত মন্দির বা বাঁধানো বেদি নেই নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তার পুজো দেয় বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী। গ্রামবাসী তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করে, তিনি তাদের তাই দেন। তিনি খাদ্য, সন্তান, সুবৃষ্টি, সুশস্য দেন। মড়ক, মহামারি রোগ, শোক থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্ত ও হিংস্র পশুর আক্রমণরোধ করেন। গবাদি পশুকে সুস্থ রাখেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতিও হয়। তাই কল্যাণ লাভের আশায় তার পুজো।

Keywords: *বাঁকুড়া, লোকসংকৃতি, লোকধর্ম, লোকদেবতা, লোকজীবন।*

Introduction:

লোকসংস্কৃতির একটি প্রাচীনতম ও প্রধান উৎস লুকিয়ে আছে প্রাচীন লোকধর্ম ও লোকদেবতাকে ঘিরে। আত্মরক্ষার তাগিদে, কিংবা অজ্ঞতা ভয় ভীতি ও কুসংস্কারের জন্যেই লোকদেবতাদের জন্ম—সমাজবিজ্ঞানীদের এই মত অবশ্যই সত্য। কিন্তু এটাও তো ঠিক, লোকসংস্কৃতির মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ঐতিহ্যের যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই এই লোকদেবতাদের সাক্ষাৎ বা প্রচ্ছন্ন প্রভাব। সমাজবিজ্ঞানী তাই লক্ষ্য করেছেন, একটি অঞ্চলের অধিকাংশ লোক-উৎসব, লোকসংগীত, লোকবাদ্য, লোকনৃত্য, লোকগল্প, লোকশিল্প, লোকঅর্থনীতি কালে কালে গড়ে উঠেছে এইসব লোকদেবতাদের অবলম্বন করেই। এদের ঘিরেই গড়ে উঠেছিল লৌকিক সম্প্রীতি ও সংহতি। এদের ঘিরেই হাজার বছর ধরে জনজীবনের ভাব-ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, ইতিহাস ঐতিহ্য উদ্ভূত হয়েছে, বিবর্তিত হয়েছে। তার মধ্যে অনেক অবিশ্বাস্য ভাবনা, উদ্ভট চেতনা, বিচিত্র বিশ্বাস ও কুৎসিত-কুসংস্কার কালে কালে জেগে উঠেছে। কিন্তু সেগুলিকে বাদ দিলে, লোকদেবতাদের এমন অনেক দিক আছে, যা জনজীবন, জনসমাজ ও জনসংস্কৃতিকে 'দেউলে' করেনি।

বাঁকুড়া জেলার লোকদেবতাদের সম্পর্কেও এই কথাটি খাটে। পশ্চিমবাংলার বোধহয় সর্বাধিক বৈচিত্র্যপূর্ণ জেলা বাঁকুড়া। তড়া-গড়া, ডুংরি-দাড়াং, পাহাড়-পর্বত, টিলা-নদী ও জঙ্গলে এর সারা গা আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে কাকুরে লালমাটির বিস্তীর্ণ মাঠ। দূরে

দূরে ছোট-বড় সব গ্রাম। শিক্ষাদীক্ষা, আলোক ও সভ্যতা থেকে দূরে থাকা দরিদ্র শ্রমজীবীদের বাস। সারা গ্রাম জুড়ে আদি-পুরুষের সংস্কার, বিশ্বাস, রীতি-নীতির নিরুপদ্রব আনাগোনা। এইসব প্রাচীন গ্রামে গেলে দেখা যাবে সে গ্রামের কোথাও না কোথাও পুজো পাচ্ছেন এইসব গ্রাম দেবতারা। এক খণ্ড শিলা, কিংবা কিছু পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া, কিংবা ছোট-বড় একটি মাটির ঢিপি, অথবা কোনও না কোনও একটি গাছ তার প্রতীক। এই স্থানটি হল তাঁর 'মড়ো' বা 'থান'। সেখানে তার কোনও মন্দির নেই। একদা কোনও বাঁধানো বেদিও ছিল না। অথচ নির্দিষ্ট দিনে সারা গ্রামের সব স্তরের মানুষ তার পুজো দিচ্ছে বিচিত্র উপচারে, পশুপাখি বলি দিয়ে, কখনও বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধনে। লোকবিশ্বাস অনুসারে, তিনি গ্রামের অভিভাবক, গ্রামরক্ষাকারী। গ্রামবাসী তাঁর কাছে যা প্রার্থনা করে, তিনি তাঁদের তাই দেন। তিনি খাদ্য, সন্তান, সুবৃষ্টি, সুশস্য দেন। মড়ক, মহামারি রোগ, শোক থেকে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন। দুর্বৃত্ত ও হিংস্র পশুর আক্রমণরোধ করেন। গবাদি পশুকে সুস্থ রাখেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট হলে মানুষের ক্ষতিও হয়। তাই কল্যাণ লাভের আশায় তার পুজো। সন্তুষ্ট করতেই তাঁর বার্ষিক উৎসব। আর তার মধ্যে থেকেই উপাসকরা পেয়েছেন উৎসবের আনন্দ, মেলার সম্প্রীতি। তার নামেই তাদের জীবনে এসেছে বিচিত্র মানস-সম্পদ – লৌকিক সংগীত, নৃত্য, বাদ্য, গালগল্প প্রভৃতি। তেমনই এসেছে বিচিত্র বস্তু সম্পদ—নানা শিল্পকলা, মাটি পাথর, বাঁশ বেতের অসামান্য সব উপকরণ। পরবর্তীকালে এসেছে মন্দিরশিল্প।

Discussion:

বাঁকুড়া জেলায় লোকদেবতা অসংখ্য। একক প্রচেষ্টায় তার হিসেব নেওয়াও কঠিন। প্রাচীন প্রায় গ্রামেই এঁদের অবস্থান। কিছু হলেন একান্তই গ্রামদেবতা—একটি মাত্র গ্রামে একটি মাত্র নামে সেই গ্রামটির মানুষদের দ্বারাই তিনি পুজো পান।

১। কালামদন / কালামহাদন:

বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার প্রসিদ্ধ গ্রাম ফুলকুসমা। গ্রামের পশ্চিমে 'হিড়োল বাগিচা'য় আঁকুড়াতলায় আছেন এ গ্রামের গ্রামদেবতা কালামদন। ইংরেজির 'L' আকৃতির একটি কালো পাথর খণ্ড তার প্রতীক। তার তিন পাশে কয়েক লক্ষ প্রাচীন-নবীন পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার স্তূপ। নিত্য পুজো করেন ঘন্টেশ্বরী ব্রাহ্মণ। 'এখ্যান' বাপয়লা মাঘতার বার্ষিকী। এদিন মেলা। ভক্তরা 'আগুন-সন্ন্যাস' করেন। এ গ্রামে গরাম, মনসা, কলকাসিনি, শিব, ষষ্ঠী, কালাচাদ প্রভৃতি অনেক লোকদেবতা আছেন। কিন্তু গ্রামবাসী তাদের বিবাহ, অন্নপ্রাশন, গৃহনির্মাণ ও নানা শুভকাজে এর নামেই ষোলোআনা (এক টাকা) মান্য তুলে রাখে। ভক্তদের বিশ্বাস- সারারাত ধরে তিনি সারা গ্রামে পাহারা দেন। নামটি শুনে মনে হয় ইনি বৌদ্ধতন্ত্রের দেবতা—কালামহাযান, কালামহাদন, কালামসন। ইনি একান্ত লোকদেবতা। যার মূলে আছে ভয়- ভীতির দেবতা 'মহাদানা' পুজো। যাদু বিশ্বাস এর উদ্ভবের মূলে।

২। ঝাঁপুড়্যা:

রাইপুর থানার সারেসকোলের গ্রামদেবতা ঝাঁপুড়্যা। শেওড়াতলায় থান। প্রতীক পোড়ামাটির হাতিঘোড়া। মাঝি সমাজের 'গুলি' পদবীর ব্যক্তি তাঁর পূজারি। বছরে তিনদিন তার পুজো— 'শ্রীপঞ্চমী', 'রোহিণী' ও 'এখ্যান' বা পয়লা মাঘ। পয়লা মাঘ বার্ষিকী। পশুপাখি বলি হয়। মেলা বসে। প্রধানত নানা রোগের ওষুধ নেওয়ার জন্যে ভিড় হয়। কিন্তু তিনি ফসলদাতা দেবতা। উর্বরতাবাদের দেবতা। ভক্তরা তাকে মানে শিব বলে। তাই কল্পিত হয়েছে, তাঁর মাথাভর্তি এলোমেলো জটা। তাই তিনি ঝাঁপুড়্যা।

৩। কোঁকাঠাকুর:

রাইপুর গ্রামে আছেন ভয়ভীতির দেবতা কোঁকাঠাকুর। বাসলী থানের পাশেইঝোপে তারঅবস্থান। প্রতীক হাতি-ঘোড়া।'বড় ভোগ' (মদ) দিয়ে তার পুজো। শাণ্ডিল্য গোত্রের লোহারেরা তার পুজারি। সারা গ্রামবাসী তার পুজো করে প্রধানত শিরঃপীড়া ঘটলে,

ঘাড় বেঁকে গেলে এবং অসংখ্য মানুষ আসে শিশুদের বোবা রোগ সারানোর জন্যে। প্রাচীন কুসংস্কার থেকেই এ দেবতার জন্ম। একটি অসম্ভব যাদু বিশ্বাস এঁর পুজোর পেছনে।

৪। ঘোড়াপাহাড়ী:

রাইপুর থানার খড়িগেড়্যা গ্রামের একদা তিলিদের কুলদেবতা ছিলেন ঘোড়াপাহাড়ী। এখন গ্রামবাসীর ঠাকুর। গ্রামপ্রান্তে থান। মাকড়াপাথরের স্তূপের ভেতর তার প্রতীক। বছরে তিনদিন পুজো– আষাঢ়েজমিতে প্রথম লাঙল নামানোর দিন, আষাঢ় শ্রাবণে জমিতে'পচান' দেওয়ার দিন, অঘ্রাণে প্রথম 'বড়ধান' কাটার দিন। এ পুজোর নাম 'তাল'। সকালে 'বাল্যভোগ'- দুধ, গুড়, চিড়ে, কাঠাল। দুপুরে পায়েস-ভোগ, খিচুড়ি ভোগ। পূজান্তে দরিদ্রনারায়ণ সেবা। এ দেবতার নামে কোনও বলি হয় না। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। লোকবিশ্বাস, তিনি ক্ষেত্র-দেবতা, শস্যরক্ষাকারী ও সুফলনদাতা। ফলে তিনি উর্বরতা তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত।

৫। মুড়াভাঙা:

রাইপুর থানার জামবনি হরিপুরের গ্রামদেবী মুড়াভাঙা। ক্যাদতলায় তার থান। তিন স্তরযুক্ত মাকড়া পাথর তার প্রতীক। লোকে বলেইনি পাতাল ফোড়া। কালী, বাঘুত, জামনানি ও কেঁদুইসিনি নামক চার দেবীকে নিয়ে তার বাস। পূজারি 'দুলে' পদবীর বাউরি সমাজের লোক। পয়লা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী ও দশহরায়পুজো। 'বড়ভোগ' (মদ)তাঁর নৈবেদ্য। প্রধানত মাথায় আঘাত লাগলে তাঁর পূজা। ফলে এক অলৌকিক যাদু বিশ্বাস এঁর পুজোর মূলে।

৬। দুলালী:

রাইপুর থানার নীলজোড়া গ্রামের গ্রামদেবী দুলালী। 'লুতিডিবাদে' শেঁয়াকুলের ঘন ঝোঁপে তার থান। সিঁদুর মাথা শিলা তার প্রতীক। তফসিলি উপজাতির সর্দারেরা তার পূজারি। বছরে পাঁচদিন তার পুজো– পয়লা মাঘ, শ্রীপঞ্চমী, চৈত্র সংক্রান্তি, রোহিণী ও অম্বুবাচীতে। অঘ্রাণে ধান পাকলে তার 'জাঁতাল'। পায়েস ও খিচুড়ি ভোগ তার নৈবেদ্য। পাঁঠাবলি হয়। প্রধানত গবাদি পশুর রোগে অসুখে, হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশে তার পুজো। এমনি দেবতা আছেন জেলার কোতুলপুর, বালিঠে গ্রামের 'বড়মা', রাইপুর থানার পাটগাড়া গ্রামের 'সাতবৌনি'। দুলাল বনে তার থান বলে এ রকম নাম। কিন্তু তিনি বৃক্ষদেবতা থেকে কৃষিকেন্দ্রিক সমাজে এক অভিনব যাদু বিশ্বাসে পরিণত হয়েছেন।

৭। বনপাহাড়ী:

সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ির গ্রামদেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বাঘুৎ তার সঙ্গী। হাতি-ঘোড়া তাদের প্রতীক। জঙ্গলে তার থান। তফসিলি মাঝি তার পূজারি। পয়লা মাঘ ও দশহরায় তার পুজো। খিচুড়ি ভোগ ও মাংস তার নৈবেদ্য। সারাদিন ধরে দরিদ্র নারায়ণের সেবা। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও সংহতি নির্মাণের উল্লেখ্য নিদর্শন। বন ও বন্যপশুর তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবী। বনে বনে যারা কাজ করে, কাঠ, মধু, তসর গুটি ও ফলমূল সংগ্রহ করে, তারা এর পুজো দেয়, প্রধানত বন্যপ্রাণী থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে। ফলে অরণ্যশক্তির এই দেবীর উৎসে আছে এক অনন্য যাদু বিশ্বাস। তাই জঙ্গল মহলে তার দৌর্দণ্ডপ্রতাপ।

৮। বলদ্যাবুড়ি:

সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ি-রায়বাঁধের গ্রামদেবী বলদ্যাবুড়ি। ক্ষেত্রের মাঝে শেঁয়াকুলের ঝোপে তার অবস্থান। হাতিঘোড়া তার প্রতীক। ৩ মাঘ—বছরে একদিন তার পুজো। পূজারী 'মাল' পদবীর উপজাতি। খিচুড়ি ভোগ তাঁর নৈবেদ্য। থানে দরিদ্রনারায়ণের সেবা। বিস্তৃত মাঠে মেলা। সেকালে সারা অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা বলদের পিঠে জিনিসপত্র নিয়ে নানা স্থানে ব্যবসায় যেত। রাত্রি

বাস করতো বলদ্যাবুড়ির থানে। থানের সামনে শিব মন্দির। চাতালে বিশ্রামের ভালো ব্যবস্থাও। সম্ভবত এই গাঁ-ঘোরা ব্যবসায়ীদের বলদ রক্ষার জন্যেই বলদ্যাবুড়ির প্রতিষ্ঠা। সুতরাং ইনি প্রাচীন পশুপুজোর নিদর্শন।

৯। খুদ্যানাড়া:

ছাতনা থানার জিড়রা গ্রামে আছেন খুদ্যানাড়া। একটি পাথরের পাটায় এক যথার্থ বীরমূর্তি অঙ্কিত—তাই হল খুদ্যানাড়ার প্রতীক। এমনই বীরমূর্তি ছাতনার কামারকুলিতে, ঘুম পাথরে ও অসংখ্য স্থানেই আছে। পণ্ডিতেরা এগুলিকে বলেন, 'মুক্তাদের সমাধি প্রথার নিদর্শন'। সম্প্রতি পুজো করেন 'বন্দ্যোপাধ্যায়' পদবীর ব্রাহ্মণেরা। কিন্তু প্রধান ব্রতী কর্মকার। সারা বছরে একদিন—১০ বৈশাখ তার পুজো। সম্প্রতি শিবের ধ্যানে পুজো। অর্থাৎ অনার্য আর্য সংস্কৃতির মিলন। লোক বিশ্বাস, শিশুর কান্না থামাতে এ দেবতার পুজো।এমনই আর এক দেবতা আছেন বাঁকুড়া থানার সানবাঁধা গ্রামে। তার নামই 'কাঁপন্যাবুড়ি'। হাতিঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। শিশুদের কান্না উপশমের জন্যে তার পুজো। এও এক যাদু বিশ্বাস। প্রজননবাদের সঙ্গেও এরা সম্পৃক্ত।

১০। বাঁদাড়া ও ছড়িদাও

ইঁদপুর থানার সাতামী গ্রামে এই দুই দেবতা আছেন গাছতলায়। এদের কোনও মূর্তি নেই, প্রতীক নেই। গাছের তলায় কল্পিত মূর্তিতে তাদের পুজো। বাঁদাড়ার পুজো ১ মাঘ – 'বড়ভোগ' (মদ)দিয়ে। প্রচুর বলি হয়, থানে বসে প্রসাদ বিলি হয়। মেয়েদের এই পুজোতে যাওয়া ও প্রসাদ ছোঁয়া নিষিদ্ধ। অথচ ইনি বন্ধ্যাত্ব-মোচন ও স্ত্রী-ব্যাধি নিবারণের দেবতা।প্রতীকহীন ছড়িদাও পূজো পান ১ মাঘ। এর থানেও প্রচুর পশুপাখি বলি হয়। তিনিও সন্তানদাতা দেবতা। শিশুদের যাবতীয় রোগের তিনি উপশমকারী। সম্ভবত একদা এই দুই দেবতাই ছিলেন প্রাচীন বৃক্ষ পুজোর সঙ্গে যুক্ত। এখন যুক্ত হয়েছেন প্রজননতন্ত্রের সঙ্গে।

১১। আমতুল্যা:

ইঁদপুর থানার পায়রাচালির গ্রামদেবতা আমতুল্যা। ধানক্ষেতের আলে পলাশ ঝোপে তার থান। পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া তার প্রতীক। ১ মাঘ, রোহিণী, অম্বুবাচী ও ইদ একাদশীতে তাঁর পুজো। পূজারি বাউরি সমাজের মানুষ। প্রধান নৈবেদ্য 'বড়ভোগ' (মদ)। ১ মাঘ বার্ষিকীতে বলি ও খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। আমগাছের তলায় আছেন বলে আমতুল্যা। কিন্তু তিনি কলেরা, বসন্ত মহামারি নিবারক বলে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ তিনি শীতলা শক্তিতে সমন্বিত। বর্ধমানের রোঁয়াই গ্রামের 'বোঁয়াইচণ্ডী', হুগলির নয়নবাটির 'বুড়িমাই' ও মেদিনীপুরের এক গণ্ডগ্রামের 'গেঁড়িবুড়িও' শীতলাশক্তির প্রকাশ।

১২। তেঁতুলমিলা:

ছাতনা থানার সীমান্তে মনিহারা-টোলা, মোহনডাঙ্গার গ্রামদেবতা তেঁতুলমিলা। তেঁতুল গাছের নীচে তার থান। হাতিঘোড়া তার প্রতীক। 'মাল' পদবীর উপজাতি তার পূজারি। ১ আষাঢ় ও ১মাঘ তার পুজো। লাল মোরগ তার প্রিয় বলি। ভূত ছাড়ানোতে তার দেশজোড়া খ্যাতি। পূজারি কবচ দেন। এখনও এই অঞ্চলে ভূতে পাওয়া, ডাইনি, পুকোস, কুদরা, সন্ন্যাসী লাগা কিংবা ভুলান লাগায় তার সাড়ম্বর পুজো। এ সবই আদিম কুসংস্কার। অর্থাৎ তেঁতুলমিলার মধ্যে আছে অপদেবতার কল্পনা—এক প্রাচীন যাদু বিশ্বাস। অশরীরী আত্মা বা ভূত-প্রেতের ভয় থেকে যার জন্ম।

১৩। খয়রাবুড়ি:

বাঁকুড়া থানার কুলমুড়ার গ্রামদেবী খয়রাবুড়ি। আঁকুড়্যা তলে হাতি-ঘোড়ার প্রতীকে তিনি বিদ্যমান। প্রাচীন ছত্রীদের ঠাকুর। এখন পুজো করেন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ। হিন্দু-মুসলমান, সাঁওতাল সকলেই এর পুজো দেয়। সম্প্রতি দুর্গার ধ্যানে পুজো। তার পুজোর

নৈবেদ্য ভাজা কলাই ও কুসুমবিচি মেশানো মুড়ি। এছাড়া পশুবলি হয়। বাতরোগ সারাতে তার দেশজোড়া নাম। ভক্ত এলেই পুজো হয়।সেবাইত ও পূজারি ওষুধ দেয়। তার ওষুধ খেলে রোগীকে মুড়ি তেল গুড় টক আমিষ ও পান ছুঁতে নেই। একদা খয়রাবুড়ি পুজো পেতেন তার আদিম থানে— কৃষি দেবতা বলে। এখন গ্রামে এসে তিনি হয়েছেন বাতরোগ উপশমকারিণী। অর্থাৎ অলৌকিক যাদু বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি যুক্ত।

১৪। ঝগড়াই:

জয়পুর থানার বৈতলে আছেন ঝগড়াভঞ্জিনী। তার ডাক নাম 'ঝগড়াই মা'। উটকো ঝগড়া, মামলা-মকদ্দমা ঘটলেই তার পুজো। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা তার মন্দির নির্মাণ করেছেন। সপ্তরেখ মন্দির, বিশাল চত্বর, আটচালা, নাটচালা। সামনে বুড়ো শিব ও ষষ্ঠী। ১৬৫ মল্লাব্দে (১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দ) এসব করেছেন মল্লরাজ রঘুনাথ সিংহ। মন্দিরের ভেতরে অপরূপ মাতৃমূর্তি — সহস্রদল পদ্মের উপর অষ্টভূজা মূর্তি। বাঁদিকের তিন হাতে ধনুক, সাপ ও খড়্গ। ডানদিকের তিন হাতে ত্রিশূল, মালা ও মুদ্রা। তার ডান পা হাতির উপরে। বাঁ পা সিংহের উপরে। একই সঙ্গে তিনি মহিষাসুরমর্দিনী ও করিঙ্গাসুরমর্দিনী। অবিকল এমনই একটি মূর্তি আছে বৈতল থেকে ২ মাইল পূর্বে নারায়ণপুরে—তিনিও অষ্টবাহু দুর্গা। লোকে বলে, তিনি ঝগড়াই-এর বোন। ঝগড়াই-এর নিত্য পুজো। ভাদ্রের শেষ শনিবারে তার 'সয়লা উৎসব। সারা অঞ্চলের মানুষ এদিন ভেঙে পড়ে। সয়লা বা মিত্রতা পাতাতে আসে শতশত ভক্ত। ভাত, ডাল, তরকারি দিয়ে তার পুজো হয়। থানে বসে সব সম্প্রদায়ের মানুষ প্রসাদ পায়। শারদীয় পুজোতে তার আর একবার সাড়ম্বর পুজো। লোকে বলে, তিনি শুধু ঝগড়াই মেটান না–শ্বেতী, রাতকানা, একশিরা প্রভৃতি রোগে ও স্ত্রী-ব্যাধি নিবারণে দলে দলে লোকে তার পুজো দেয়। মাদুলি নেয়। হত্যা দেয় অনেকে। সয়লা উৎসবে বিশাল মেলা।এদিন 'কাদামাটি খেলা' হয়। ঝগড়াইমাকে নিয়ে অসংখ্য লোককথা প্রচলিত। শুধু বন্ধ্যাত্ব মোচন নয়, সম্প্রীতি সৃষ্টিতে তার অসামান্য নামডাক।

সারা বাঁকুড়া জেলায় গ্রামে গ্রামে এমনই অসংখ্য লোকদেবতারা আছেন। খাতড়া থানার পাঁপড়া গ্রামের মাঠদেবতা কালোসোনা। তিনি সুফলনের দেবতা। রাণীবাঁধ থানার তুংচাঁড়রোর হাতিখেদা—তিনি হাতিভয় নিবারণকারী দেবতা। কোতুলপুর থানার মসিনাপুরে বাঁশদেব। তিনি বৃষ্টির দেবতা। ইঁদপুর থানার কুমির পাথর বাগডিহার পাশে ভালুকা গ্রামের বাগাল্যা। তিনি পশুরক্ষক দেবতা। ছাতনা থানার পাহাড় শুশুনিয়ায় আছেন লড়সিং। তিনি সুবৃষ্টির দেবতা। পাউড়ি আছেন সিমলাপাল থানার বনদুবরাজপুরে ও রানীবাঁধ থানার ধডাঙ্গাগ্রামে। দুই স্থানের দেবতাই করগা নামক পাথর শিল্পীদের দেবতা। যারা পাথর কেটে থালা বাটি ঘটি প্রদীপ নির্মাণ করে, কিংবা যারা কাঠ কুঁদে খাটের পায়া পাইকনা ইত্যাদি তৈরি করে। শালতোড়া থানার রাউতোড়া গ্রামে আছেন ভিরকুনাথ। তিনি পূর্বপুরুষ পুজোর নিদর্শন। পূর্বপুরুষ পুজোর এমনই নিদর্শন আছে রাইপুর থানার সারেঙ্গা গ্রামের লখন-মাঝি ও সাধন-বোঙ্গা, ওন্দা থানার বেলিয়াড়া গ্রামের চাঁদরায়, ছাতনা থানার জিড়রা গ্রামের বুড়াবুড়ি, রাইপুর থানার সিমলি গ্রামের ননদভাজ, ছাতনা থানার থুমপাথরের ভাসুরবোয়াসিন, ওন্দা থানার মেদিনীপুর গ্রামের খঁকাখুকি প্রভৃতি। এরা কিন্তু একই শক্তির আধার নন। কিন্তু অধিকাংশই প্রজননবাদের সঙ্গে যুক্ত।

বাঁকুড়া জেলায় আর এক শ্রেণীর লোকদেবতারা আছেন— যাঁদের একটিমাত্র নাম, অথচ অসংখ্য গ্রামে তারা পুজো পাচ্ছেন। এঁরা হলেন—মনসা, চণ্ডী, সিনি বাসলী, সাতবইনী, রংকিনী, ষষ্ঠীএবং গরাম, বড়াম মাদানা, কুদরা, সন্ন্যাসী, বাযুৎ, পঞ্চানন, ভান সিং, ভৈরব শিব ও ধর্মঠাকুর। এরা প্রায় গ্রামেই আছেন। শয়ে শয়ে আছেন। আমরা তন্মধ্যে কিছু অতি বিখ্যাত লোকদেবতার পরিচয় দিচ্ছি।

১। বাঘুৎ:

বাঁকুড়ার এক ভয়ঙ্কর, হিংস্র, প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকদেবতা বাঘুৎ। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তার অগণিত থান। রাইপুর

থানার কালুড়ি, কোলমুড়ারি, ফুলকুসমা, পাথরা, মণ্ডলডিহা, রসপাল, শালপাতড়া-রানীবাঁধ থানার ছেঁদাপাথর, ফুলঝোর, বনতলা, রানীবাধে তার প্রসিদ্ধ থান। কোথাও বাঘের মূর্তি। কোথাও হাতি- ঘোড়ার প্রতীক। বাঘের আক্রমণ থেকে রক্ষাকারী দেবতা বাঘুৎ। দক্ষিণবঙ্গে এর নাম 'দক্ষিণ রায়'। উত্তরবঙ্গে এঁর নাম 'কুমিরদেব', কোচবিহারে 'ডাংধরা', জলপাইগুড়িতে 'মহারাজা ঠাকুর', আসামে 'সাতশিকারী'। কিন্তু বাঁকুড়ার বাঘুতের মতো কেউ এমন অসম্ভবমেজাজী বলে কথিত নয়। মহেঞ্জোদরো-হরপ্পার শিলমোহরে বাঘচিত্র আছে। সমাজে 'বাঘ' পদবী আছে। নরখাদক বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতেই এর পুজো। সুতরাং বাঘুৎ পশু পুজোর নামান্তর – বাঘ পুজোর অনন্য নিদর্শন।

২। মাদানা:

সারা উত্তর-পশ্চিম বাঁকুড়ায় মাদানার অনেক থান। মিথিলা, তিলাবেদ্যা, বাদকোনা, মণিহারা, কুলমুড়া, বেলিয়াতোড়, বাঘডিহা, নদ্যাপুর, কাঞ্চনপুর, বেলাবাঘড়ায় তিনি প্রসিদ্ধ কৃষি দেবতা। প্রায় স্থানেই বাউরি পূজক। চাষীরা তার উপাসক। ১ মাঘ 'এখ্যানে' তার 'জাঁতাল'—ঘি খিচুড়ি দিয়ে, পশুপাখি বলি দিয়ে। এছাড়াও চাষের আগে-পরে মাঝে তার পুজো। সারাদিন ধরে থানে উৎসব। 'মহাদানব' থেকে 'মাদানা'। তার অর্থ 'দৈত্য'। সংস্কারাচ্ছন্ন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বাউরিদের তিনি ছিলেন একান্ত দেবতা। তখন ছিলেন ভয়ভীতির দেবতা। পরে তিনি উন্নীত হয়েছেন প্রজননবাদের দেবতায়, শস্যদাতা বলে।

৩। গরাম:

বাঁকুড়া জেলার সবচেয়ে প্রাচীন লোকদেবতা বলে গরাম ঠাকুর মর্যাদা পেয়েছেন। সারা দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়ায় তার শতাধিক থান। হাতি-ঘোড়া বা গাছ, পাথর তার প্রতীক। উপজাতি ও সাঁওতালেরা তার উপাসক। ১ মাঘ, দোলপূর্ণিমা এবং প্রথম বৃষ্টির পরে, ধান রোয়ার আগে, কাটার আগে ও পরে সারা চাষী সমাজ তার পুজো করে। এ জেলার গোপালপুর, গোড়োল, চেলাপাড়া, জামথলি, ধোবারগ্রাম, বুড়িশোল ও বারোপায়া প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে গরামের মেলা বসে। দিনরাত চলে কাড়ানাকাড়ার বাজনা। 'বড়ভোগ' (মদ)তার প্রধান নৈবেদ্য। ভক্তরা সবরকম প্রার্থনা তাকে জানায়। তিনি সুবৃষ্টি, রোগমুক্তি, শস্যবংশবৃদ্ধি ইত্যাদির দেবতা। পাথরে বৃক্ষে নদীর ভেতরে তার পুজো বলে তাকে প্রজননবাদের সঙ্গে প্রাচীন প্রস্তর পুজো, বৃক্ষপুজো ও নদীপুজোর নামান্তর করা হয়ে থাকে। একে নিয়ে প্রচুর গান, গল্প, কাহিনীরয়েছে।

৪। বাসলী:

বাঁকুড়া জেলার ছাতনাকে ঘিরে শতাধিক স্থানে আছেন লোকদেবী বাসলী। ছাতনা শহরে তার প্রধান পীঠ। এখানে তার দু'টি থান—একটি থানার কাছে, অন্যটি রাজদরবারে। প্রথমটি বড়ুচণ্ডীদাসের পুজিতা বাসলী—এখন তার মন্দির ধ্বংস হয়েছে। আছে 'বাসলী পুকুর, 'ধোপা পুকুর' ও 'চণ্ডীদাসের সমাধি'। রাজদরবারে তার পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে রানী আনন্দকুমারী নির্মাণকরেন। এখানে প্রাচীন প্রস্তরখোদিত নারীমূর্তি। দুই স্থানেই নিত্যপুজো। থানা গোড়ায় বার্ষিক উৎসব ফাল্গুনে, শুক্লা সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত। রাজদরবারে তার বার্ষিকী ১১-১২ জ্যৈষ্ঠ। এখানে ডাল, ভাত ও খালাপোড়া নামের একটি পদ তার নৈবেদ্য। শাস্ত্রীয় মর্যাদায় পুজো হলেও গ্রাম দেবতার সব লক্ষণ তার পুজোরীতিতে। তিনি প্রধানত বন্ধ্যাত্ব মোচনের দেবতা। এই বাসলীকে স্মরণ করেই বড়ুচণ্ডীদাস 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যেলিখেছেন-'গাইল বড়ুচণ্ডীদাস বাসলীগণ'।

৫। আটবাইচণ্ডী:

সারা বাঁকুড়া জেলায় চণ্ডীনামে দেবতা আছেন কয়েক শতাধিক। নানা স্থানে নানা নাম। খুদকুড়ি গ্রামে খুদাই চণ্ডী, বিশিল্ডা গ্রামে বিশাই চণ্ডী, শিহড়ে বসনচণ্ডী, মেলেড়ায় নেওটন চণ্ডী। আটবাইচণ্ডী গ্রামে তার নাম আটবাইচণ্ডী। ইনি একটি বিস্ময়াবহ

শিলামূর্তি। এক বলিষ্ঠ পুরুষের উপরে এক বিকটদর্শনা দশভূজা নারী দণ্ডায়মানা। দশহাতে অস্ত্র কিংবা মুদ্রা। কোমরে ঝুলন্ত ছোরা, গলায় ও কপালে মুণ্ডমালা। মাথার চুলে মড়ার খুলি। সারা দেহটি যেন এক নরকঙ্কাল। দৈর্ঘ্যে ৩ ফুট, প্রস্থে ২ ফুট। বলাবাহুল্য, এ মূর্তি অনেক পরবর্তী সংযোজনা। এখন চণ্ডীর ধ্যানে পূজিত। ১ মাঘ বার্ষিকী ও মেলা।

৬। মনসা:

সারা জেলাতেই মনসা আছেন গ্রামে গ্রামে। তার প্রাচীন শিলাখোদিত মূর্তি আছে রাউৎখণ্ড, ডাংগরসাই, লাপুর, বারপেট্যা, কুচেকোন, বাজেময়নাপুর, বেলিয়াড়া, ভৈরবপুর, ফুটকরা ও জয়কৃষ্ণপুরে। আর সর্বত্রই আছে পাঁচমুড়ার তৈরি মনসাচালি, মনসাঝাড়। গৃহস্থবাড়িতে তার পুজো উনুনে। তার প্রধান পুজো জ্যৈষ্ঠে দশহরায়, শ্রাবণসংক্রান্তি ও আশ্বিনে ডাকসংক্রান্তিতে। এ সময় ঝাঁপান হয়। বিষ্ণুপুর রাজবাটি প্রাঙ্গণে এখনও হয় 'বাঘঝাঁপান'। অযোধ্যাগ্রামে দশহরায় অনুষ্ঠিতকালীবুড়ি মনসার উৎসব জেলার শ্রেষ্ঠ মনসা উৎসব। এ সময় দেবীর গাজন, ভক্ত্যানাচ, প্রণামসেবা, দণ্ডীখাটা, আগুনসন্ন্যাস, ফুলকাড়ানো ও সয়লাহয়ে থাকে। মনসা সর্পদেবী। তিনি যাদুবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত। তাঁকে নিয়ে অগণিত গান, গল্প, কাহিনীরয়েছে।

৭। রংকিণী:

জেলার বেশ কিছু স্থানে লোকদেবী রংকিণী আছেন– তন্মধ্যে লক্ষ্মীসাগর, পাত্রসায়র, খাতড়া, কৃষ্ণনগর (বড়জোড়া থানা) ও হতাকাটার রংকিণীপুজো প্রসিদ্ধ। তাঁর শিলাখোদিত ভয়ংকর মূর্তি আছে লক্ষ্মীসাগরে। প্রায় ২.৫ ফুট উঁচু। মাথায় পাথরের চূড়া। তিনি নৃমুণ্ডমালিনী, অষ্টভুজা, শৃগালবাহিনী। গোল চোখ, বিকট দাঁত, পদতলে ভৈরব। নিত্যপুজোহয়। লোকের ধারণা—তিনি নররক্তপিপাসু, তাইপ্রাণরক্ষার্থে তার পুজো।একদা প্রতিটি স্থানেই নরবলি হতো। তবে এখন তিনি পুজো পান কোথাও স্ত্রীব্যাধি বা মড়ক মহামারী নিবারনী বলে, কোথাও পশুরক্ষার্থে। আদিবাসীদের কাছে তিনি 'শিকারদেবতি'। রংকিণীকে নিয়ে প্রচুর লোকগল্পরয়েছে।

৮। বড়াম:

জেলার অসংখ্য আদিবাসী পল্লীতে পুজো পান বড়াম। একদা তিনি ছিলেন ভূমিজদের দেবতা। বৈতল, বালিঠা, গোপীবল্লভপুর, শিহড় প্রভৃতি গ্রামে ভূমিজরাই তাঁর প্রধান উপাসক। মকরসংক্রান্তিতে তার বার্ষিকী। এদিন শূকর বলি হয়। থানে বসে সকলে অন্ন প্রসাদ নেয়। বন্যজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষার্থে তার পুজো। জানডাঙ্গা, লেদরা, পড়াশ্যা, কালুডি, জানকিবাঁধ প্রভৃতি স্থানে তিনি পশুরক্ষাকারিণী। বড়ামকে নিয়ে অসংখ্য লোককথারয়েছে।

৯। শিব:

জেলার সর্বত্র আছেন শিব। এখনো পর্যন্ত সাত শতাধিক শিবথানের নাম তালিকাভুক্তকরা সম্ভব হয়েছে। তন্মধ্যে বিখ্যাত থান— এক্তেশ্বর, বোলাডা, ডিহর, শিশুড়, নিকুঞ্জপুর, লোদনা, পাঁচান, পাত্রসায়র, জগন্নাথপুর, ঝাঁটিপাহাড়ি, সায়েগা, রাইপুর, বিষ্ণুপুর, কোয়ালপাড়া, দারিয়াপুর (সোনামুখী থানা), শাশপুর করিশুন্ডা, আমরুন, সালনা (পাত্রসায়র থানা), বীরসিংহ (পাত্রসায়র) প্রভৃতি। অসংখ্য স্থানেই তার ঐতিহাসিক মন্দির। বোলাড়ার মন্দির বিস্ময়কর। প্রতিদিন তার পুজো। সোম-শুক্রবারে প্রচণ্ড ভিড়হয়। ফাল্গুনে শিবরাত্রীও চৈত্রে গাজন-এই দুই সময় অগণিত থানে মেলাবসে। গাজন উৎসবে বিচিত্র শ্রেণীর ভক্ত্যার সমাবেশহয়, বাণফোঁড়া, দণ্ডীখাচা, আগুনসন্ন্যা হিন্দোল, বেতভাঙা, চড়কে ঘোরা প্রভৃতি কৃচ্ছসাধনা করেন ভক্ত্যারা। ভক্তদের কাছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর—তাই তার নাম এক্তেশ্বর, মল্লেশ্বর, সারেশ্বর, ষাঁড়েশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, হাকন্দেশ্বর প্রভৃতি। শিবপুজো পান প্রধানত তিনি সন্তানদাতা বলে। তবে তিনি ক্ষেত্রপাল কৃষিদেবতাও। শিবকে নিয়ে প্রচুর লোকগীতি আছে।

১০। ধর্মঠাকুর:

জেলার এক প্রধান লোকদেবতা ধর্মঠাকুর। শিবের মতোই তারও অসংখ্য নাম—কালু রায়, ক্ষুদি রায়, বাঁকা রায় বা ক্ষুদিনারায়ণ, বীজনারায়ণ, স্বরূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ। ময়নাপুরে নাম যাত্রাসিদ্ধি, রাজশোলে আঁধারকুলি। তাঁর প্রসিদ্ধ থান—ময়নাপুর, বেলেতোড়, মটগোদা, বৈতল, মসিনাপুর প্রভৃতি। প্রত্যহ পুজো। প্রধান উৎসব বৈশাখী পূর্ণিমায় ঠিক শিবের গাজনের মতোই উৎসব। ময়নাপুরে হয় 'গৃহভরণ' (ঘরভরা) অনুষ্ঠান। বেলেতোড়ে গাজন আষাঢ়-পূর্ণিমায়। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমায় গাজন ইন্দাস, খাড়ারি, দামোদরবাটি, মেজিয়া ও বেহারে। তবে ধর্মঠাকুরের কোনও মূর্তি নেই, গোলশিলা তাঁর প্রতীক। প্রধানত কুষ্ঠরোগ, চক্ষুরোগ ও বন্ধ্যাত্বমোচনে তার প্রসিদ্ধি। একে নিয়ে প্রচুর আখ্যান কবি, ক্ষুদ্রকবিতা ও লোকগীতি মেলে।

১১। সিনি ঠাকুর:

বাঁকুড়ায় সিনি নামে এক লোকদেবী আছেন শতাধিক গ্রামে। শিলাখণ্ডে, মাটির ঢিপিতে, গাছের গুড়িতে, বিলে-পুকুরে, ক্ষেতে-খামারে, গ্রামে-গঞ্জে তিনি পুজো পান। তিনি একান্ত লৌকিক দেবী, নামেই তার প্রকাশ- আকুয়াসিনি, ঐয়াসিনি, কড়াপিনি, খাঁদাইসিনি, গরাসিনি, ঘোলাসিনি, চাঁচসিনি, ছেঁদাসিনি, জিনাসিনি, দামাসিনি প্রভৃতি। তন্মধ্যে বাঁকুড়া শহরে জিনাসিনি, লোদনার লদাসিনি, ছান্দারের জঙ্গলাসিনির পাথরে খোদিত চমৎকার মূর্তি স্থাপিত। জিনাসিনি অশ্বারোহিণী। তার ৪ হাতে সাপ, গদা, অসি ও চক্র। সিনিদেবীদের পুজোর প্রধান দিন পয়লা মাঘ। শস্য, সন্তান, সুবৃষ্টি প্রদাত্রী ও মড়কমহামারী, দুর্ভিক্ষ নিবারণী বলে তার পুজো।

এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার সর্বত্রই পুজো পান বসন্তনাশিনী শীতলা, ক্ষেত্রঠাকরুণ সাতবৈনী, শিশুরক্ষক পঞ্চানন্দ, ভয়নিবারক সন্ন্যাসী, ধনদেবতা কুদরা ও অরণ্যদেবতা ভৈরব। ব্রতদেবতা হিসেবে পুজো পান ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সত্যনারায়ণ। ভাদু-টুসুও পুজো পান অনেকটা দেবীদের মতোই। আদিবাসী সমাজের বিশেষ ব্রত করম। উত্তর বাঁকুড়ার নড়রা, উদয়পুর, কৃষ্ণপুর, সাভানপুর প্রভৃতি গ্রামে দেখি ভেঁপুব্রত—তিনিও সন্তানদাতা। এছাড়াও নানাস্থানে নানা নামে পুজো পান আরও বহু লোকদেবতা। যেমন—অম্বিকানগরে অম্বিকা, রসপালে বলরাম, সাবড়াকোণে ডেঙ্গো-রামকৃষ্ণ, সোনামুখীতে সোনামুখী,পাঁচালে পরেশমণি, সুখসায়রে যোগাদ্যা, রাইপুর ও সাহারজোড়ায় মহামায়া প্রভৃতি। কালীও এখন পুজো পাচ্ছেন লোকদেবী বলে। স্বাভাবিক কারণেই লোকদেবতাদের প্রভাব নেমেছে একেবারে নীচের ধাপে। কিন্তু তাদের ঘিরে সৃষ্ট হয়েছে হাজার হাজার লোকগান। এদের মেলাকে ঘিরে এখনও বাঁকুড়াবাসী পাতা নাচ, কাঠি নাচ, ঘোড়া নাচ, খাঁটি নাচ, ভূয়াং কিংবা লবয়ে নাচে মেতে ওঠে। এদের ঘিরে বিকনায় ঢোকরা শিল্প, পাঁচমুড়ায় মৃৎশিল্প, শুশুনিয়ায় পাথরশিল্প। এদের ঘিরে যেসব মন্দির শিল্প গড়ে উঠেছে, এদের নামে যে সব শিলামূর্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি কিন্তু জেলার গৌরব।

Conclusion:

লোকসমাজ একদিন আপন নিঃসঙ্গতার জন্য প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক জৈব ও দৈব জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ভয় পেয়েছিল। কালের অগ্রগতিতে মানুষ যখন হাতিয়ার আবিষ্কার করতে শিখল (প্রস্তর ও নব্য প্রস্তর যুগে), তখন দৈব ও জড় শক্তিকে মানুষ বশীভূত করে ফেলেছিল। বশীভূত করতে গিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মানুষ ব্যবহার করেছিল জাদু-মন্ত্র। অনুকরণমূলক ও সাদৃশ্যমূলক জাদুপ্রক্রিয়ার সাহায্যে অপ্রতিহত দৈব ও নৈসর্গিক শক্তিকে মানুষ আপন বশে আনতে চেষ্টা করেছিল। সৃষ্টি হলো জাদু-ধর্ম-বিজ্ঞান। মানুষের হাতিয়ার বদলের পালা এখান থেকেই শুরু। অথচ এই ভৌতিক, দৈবিক বা জৈবিক শক্তিসমূহ মানব সমাজের একেবারে গভীরে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েগিয়েছিল। ফলে দেবতা হয়ে গেল প্রিয়, আবার কোথাও প্রিয় হয়ে গেল দেবতা।তাই বাঁকুড়ার লোকদেবতার সন্ধান করতে গিয়েদেখলামলৌকিক দেবতারা দু'ধরনের- শুভংকরী

ওভয়ংকরী। মানুষের সভ্যতার আদিপর্বেই জাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, তুক্তাক্ ছিল পরাক্রান্ত শক্তিসমূহ বশীকরণের অন্যতম হাতিয়ার। আর হাতিয়ার সৃষ্টির পর লোকদেবতারা হয়ে উঠলেন উৎপাদনের সহায়ক দেবতা। এখনও দেবতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে চলছে মহাকালের করস্পর্শে, হয়ত কেউ ধরা থেকে বিদায় নেবেন, আবার কেউবা নবজাতকের মত সমাজের কোলে আশ্রয় নেবেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বসু গোপেন্দ্র কৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

২. কামিল্যা মিহির চৌধুরী, আঞ্চলিক দেবতা: লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০০

৩. মিত্র অশোক (সম্পাদনা), পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা, পঃ বঃসরকার, ১৯৭১

৪. সিংহ মানিকলাল, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, বিষ্ণুপুর, ১৩৮৪

৫. ভট্টাচার্য তরুণদেব, বাঁকুড়া - পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২, কেএলএম প্রা: লি:, কলকাতা, ১৯৮২

৬. সামন্ত রবীন্দ্রনাথ, বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা, পুস্তক বিপনী, কলকাতা, ১৯৮১

৭. পাল লক্ষ্মীকান্ত, দক্ষিণ রাঢ় সংস্কৃতি পরিক্রমা: মল্লভূম, বাঁকুড়া, ২০১৫

৮. চক্রবর্তী মৃগাঙ্ক, বাংলার বিচিত্র দেবদেবী, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৬

৯. চক্রবর্তী মৃগাঙ্ক, বাংলার দেবতা, অপদেবতা ও লোকদেবতা, খড়ি প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮

১০. চৌধুরী দুলাল (সম্পাদনা), বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, আকাদেমি অব ফোকলোর, কলকাতা, ২০০৪

Citation: **চৌধুরী. অ.,** (2025) "বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-02, February-2025.